অর্থ শাস্ত্রের মৌলিক পরিভাষা

ভূমিকা

'অর্থ' শব্দের একটি অর্থ উদ্দেশ্যে বা তাৎপর্য হলেও এখানে অর্থ মানে, ধন- দৌলত, পয়সা-কড়ি, বিত্ত-সম্পত্তি, বিষয় ঐশ্বর্য, সংগতি, পুঁজি। জীবিকা, জীবনোপকরণ, সহায়-সম্বল, অবলম্বন। ইংরেজি ভাষায় অর্থকে বলা হয়, Wealth, Money। আরবি ভাষায় অর্থ- সম্পদ, জীবিকা, জীবন-সামগ্রী ইত্যাদি বোঝানোর জন্যে ব্যবহার হয়, (মাল) বহুবচনে । কুরআনে অর্থ-সম্পদ ও জীবিকা বোঝানোর জন্যে উক্ত শব্দগুলো ছাড়াও রূপক অর্থে (আল্লাহর অনুগ্রহ) এবং (আল্লাহর দান) শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে।

মূলত জীবন ধারণ ও জীবন যাপনের জন্যে মানুষের যেসব উপায়-উপকরণ এবং সহায়-সম্বল প্রয়োজন হয় সেগুলোকে বা সেগুলোর বিকল্পকেই অর্থ-সম্পদ বা জীবিকা বলা হয়।

অর্থনীতি

অর্থনীতির সংজ্ঞা নির্ণয় করা কঠিন। অর্থনীতি যেহেতু একটি সামাজিক বিজ্ঞান, তাই সমাজ বিশ্লেষণের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজবিজ্ঞানীগণ অর্থনীতির সংজ্ঞা নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন। সমাজকাঠামোর একটি ধারা হলো অর্থনৈতিক ধারা। এ ধারার যারা বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত, তাদের মধ্যে অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith), অধ্যাপক মর্শাল (Prof. Marshall), অধ্যাপক এল. রবিন্স (Prof. L. Robbins), জন স্টুয়ার্ট মিল, অধ্যাপক ক্যানান, স্যামুয়েলসন প্রমুখ অর্থনীতির বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

অ্যাডাম স্মিথের মতে, 'অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা জাতিসমূহের সম্পদের প্রকৃতি ও কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে।'

অধ্যাপক মর্শালের মতে, 'অর্থনীতি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কার্যাবলি আলোচনা করে।'

অধ্যাপক ক্যানান বলেন, 'অর্থনীতি হলো মানুষের বস্তুগত কল্যাণের কারণ অনুসন্ধানকারী বিষয়।'

অর্থনীতিবিদগণ অর্থনীতিকে ইতিবাচক এবং নীতিবাচক—এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। এ প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদগণ বিভক্ত হয়ে পড়েছেন।

ইতিবাচকপন্থিরা বলতে চান, যা আছে, যা হচ্ছে, এবং যা ঘটছে, তার সমাধান নির্দেশনাই অর্থনীতির কাজ।

নীতিবাচকপন্থিরা বলতে চান, কী হওয়া উচিত, আর কী হওয়া উচিত নয় এবং কী করা উচিত, আর কী করা উচিত নয়, সেই নির্দেশনা প্রদানই অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। যাকে কল্যাণ অর্থনীতিও বলা হয়।

অর্থনীতির ইসলামী সংজ্ঞা

ইসলাম অর্থনীতির আলাদা অস্বাভাবিক কোনো সংজ্ঞা প্রদান করে না। ইসলাম বলে, সম্পদের মূল মালিক মহান আল্লাহ, মানুষ সম্পদের আমানতদার এবং অর্থ মানব-জীবনের অখণ্ড ও অবিভাজ্য বিষয়সমূহের একটি মাত্র। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে, 'আল্লাহ নির্দেশিত জীবন-দর্শনের ভিত্তিতে মানুষের জীবিকা আহরণ, আহরিত সম্পদের ন্যায্য বণ্টন এবং সুষ্ঠু ও সুন্দর ব্যয় ও ভোগ ব্যবহারের নির্দেশনাই অর্থনীতি।'

আধুনিক অর্থনীতিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়-

১। ব্যাষ্টিক অর্থনীতি (Micro Economics)- Micro এর অর্থ হলো ক্ষুদ্র। ব্যাষ্কিক অর্থনীতি মূলত ব্যক্তি, পরিবার এবং ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলি চাহিদা ও যোগ নিয়ে আলোচনা করে থাকে।

২। ব্যাষ্টিক অর্থনীতি (Macro Economics)- Macro- এর অর্থ বড় বা বৃহৎ। সামষ্টিক অর্থনীতি একটি দেশের জাতীয় বা আঞ্চলিক অর্থনীতির সামগ্রিক কর্মদক্ষতা, কাঠামো, নীতি ও আচরণ নিয়ে আলোচনা করে।

বর্তমান বিশ্বে চার ধরণের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত

১। ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা,

২। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা

৩। মিশ্র অর্থব্যবস্থা

৪। ইসলামী অর্থব্যবস্থা

১. পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা (Capitalistic Economy System) এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে উৎপাদনের উপকরণগুলোর ওপর চরম ব্যক্তিমালিকানা বজায় থাকে। উৎপাদন, বিনিয়োগ ও ভোগসহ সমাজের সব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যক্তিগত উদ্যোগে সরকারি হস্তক্ষেপ ছাড়া স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা ও অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ভোগের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। এ ধরনের অর্থব্যবস্থাকে অবাধ বা মুক্ত অর্থনীতিও বলে।
২. যে অর্থব্যবস্থায় সম্পদ ও উৎপাদনের উপাদানসমূহের ওপর একচ্ছত্র রাষ্ট্রীয় মালিকানা বজায় থাকে বা কোনো ব্যক্তি মালিকানার অস্তিত্ব থাকে না, তাকে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা (Socialistic Economy System) বলে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে কলকারখানা, খনি প্রভৃতির ওপর সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ সমাজকল্যাণে উৎপাদন, বণ্টন এবং ভোগ নিয়ন্ত্রিত করে। এই অর্থব্যবস্থাকে পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থাও বলা হয়।
৩. যে অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদের রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিমালিকানা এবং সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বিরাজ করে, তাকে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বা মিশ্র অর্থনীতি (MIxed Economics) বলে। এ ব্যবস্থায় ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়। মিশ্র অর্থনীতিতে বেসরকারি খাতের ওপর কতগুলো খাত ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু মৌলিক ও ভারী শিল্প, জাতীয় নিরাপত্তা ও জনগুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা হয়। বাংলাদেশে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিরাজমান।
৪. কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালিত অর্থব্যবস্থাকে ইসলামী অর্থব্যবস্থা বলা হয়।

সম্পদের প্রকারভেদ
উৎপত্তির দিক থেকে সম্পদ তিন প্রকার।
যথা- ক) প্রাকৃতিক সম্পদ, খ) মানবিক সম্পদ, গ) উৎপাদিত সম্পদ
মালিকানার ভিত্তিতে সম্পদ চার প্রকার।
যথা- ক) ব্যক্তিগত, খ) সমষ্টিগত, গ) জাতীয় ও ঘ) আন্তর্জাতিক সম্পদ

মোট দেশজ উৎপাদন
একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে মোট যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন হয় তার বাজার মূল্যের সমষ্টিকে মোট দেশজ উৎপাদন বা (Gross Domestic Product) GDP বলা হয়।
মাথাপিছু GDP বলতে জনপ্রতি বার্ষিক জিডিপিকে বোঝায়। মোট দেশজ উৎপাদন মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাথাপিছু জিডিপি পাওয়া যায়। মাথাপিছু জিডিপি হলো একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার প্রধান সূচক। জিডিপি বৃদ্ধির দিক থেকে বিশ্বে বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থান পৃথিবীর ৫ম অর্থনীতি।
বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রধান খাতগুলো হলো- কৃষি খাত, শিল্প খাত, সেবা খাত।

প্রবৃদ্ধি ও প্রবৃদ্ধির হার
কোন নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত ঃ ১ বছরে একটি দেশে জাতীয় আয় তথা GNP বৃদ্ধি পাওয়াকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলা হয়। অর্থনীতিতে এক বা একাদিক খাতে উৎপাদন বাড়লে মোট জাতীয় আয় বাড়ে। জাতীয় আয়ের এ বৃদ্ধিই সাধারণত প্রবৃদ্ধি হিসেবে বিবেচিত।
অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি হিসেব করা হয় বিগত বছরের তুলনায় বর্তমান বছরের জাতীয় আয় বৃদ্ধির পরিমাণ থেকে। অর্থাৎ গেল বছরের তুলনায় বর্তমান বছরে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাওয়াকে প্রবৃদ্ধি বলা হয়। এ প্রবৃদ্ধি শতকরা হারে হিসেব করা হয় বলে তাকে প্রবৃদ্ধির হার বলা হয়। **বিগত বছরের তুলনায় বর্তমান বছরের জাতীয় আয়ের বৃদ্ধিকে বিগত বছরের জাতীয় আয় দ্বারা ভাগ করলে GNP প্রবৃদ্ধির হার পাওয়া যায়।**

প্রবৃদ্ধি বনাম উন্নয়ন

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধারণা দু'টির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। যেমন-
১। দেশে এক বা একাধিক খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাওয়াকে প্রবৃদ্ধি বলা হয়। পক্ষান্তরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগযোগ, পরিবহন, কারিগরি ও প্রযুক্তি ইত্যাদি) মাথাপিছু জাতীয় আয় অব্যাহত ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে।
২। কোন দেশে জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে একথা বলা যায় না। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটলে অবশ্যই প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়।
৩। অর্থনৈতিক উন্নয়ন দেশের সামগ্রীক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসহ সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রের গুণগত পরিবর্তন নির্দেশ করে। কিন্তু প্রবৃদ্ধি শুধুমাত্র উৎপাদন ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির পরিমাণগত পরিবর্তন নির্দেশ করে।
৪। প্রবৃদ্ধির হার বেশি হলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে এমন কোন কথা নেই। আবার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটলেও প্রবৃদ্ধির হার কম থাকতে পারে। যেমন- কুয়েতের প্রবৃদ্ধির হার ভারতের তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু কুয়েতের অর্থনৈতিক ভারতের তুলনায় গুণগত পরিবর্তন কম হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কারিগরি ও নিজস্ব প্রযুক্তির উন্নয়ন ভাতের তুলনায় কুয়েতে কম হয়েছে। তাই দেখা যায় কুয়েতে তেল উত্তোলনে কিংবা অবকাঠামোর উন্নয়নে ভারত থেকে প্রকৌশলী ও বিশেষজ্ঞ আমদানি করতে হয়। কাজেই কুয়েত ধনী হলেও ভারতের তুলনায় অনুন্নত। আবার ভারত গরীব হলেও কুয়েতের তুলনায় উন্নত।

দারিদ্র ও চরম দারিদ্র

দারিদ্র পরিমাপে খাদ্রগ্রহণ বা প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। সে অনুযায়ী কোন ব্যক্তি প্রতিদিন দুই হাজার ১২২ ক্যালরির কম খাদ্য গ্রহণ করলে দারিদ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। আর এক হাজার ৮০৫ ক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণ করলে তিনি চরম দরিদ্র।
বাংলাদেশে খাদ্য গ্রহণের পাশাপাশি মৌলিক চাহিদা ব্যয় (সিবিএন) পদ্ধতিও অনুসরণ করে থাকে বিবিএস। এতে খাদ্য, শিক্ষা, বস্থসহ মৌলিক ১১টি সুবিধা মানুষ কতটা পাচ্ছে, সেই হিসাবও করা হয়।
বাংলাদেশের দারিদ্রের হার এখন ২৫.৬ শতাংশ। গত এক বছরে দেশের দারিদ্রের হার কমেছে দশমিক ৮ শতাংশ। পাশাপাশি অতি দারিদ্রের হার এখন ১২ দশমিক ৪ শতাংশ। এই হিসাব সালের জুন মাস পর্যন্ত।

যোগান

কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট দামে উৎপাদনকারী/বিক্রেতা তার মজুদ থেকে যে পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করতে প্রস্তুত থাকে তাকে যোগান বলা হয়। যোগান ও মজুদ ধারণা দুটির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। **বিক্রয়যোগ্য মোট উৎপাদিত পণ্যকে মজুদ বলা হয়**। অপরদিকে মজুদের যে অংশ বিক্রেতা নির্দিষ্ট কোন দামে বিক্রয় করতে চায় তাকে যোগান বলে। কাজেই যোগান হল মজুদের একটি অংশ মাত্র। যোগান একটি নির্দিষ্ট দামের সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু মজুদের সাথে নির্দিষ্ট কোন দামের সম্পর্ক নেই।

চাহিদা

সাধারণত কোন পণ্য পাওয়া বা ভোগ করার ইচ্ছাকে চাহিদা বলে। তবে অর্থনীতিতে চাহিদা শব্দটি একটি বিশেষ অর্থ বহন করে। (প্রয়োজনীয় ক্রয়ক্ষমতা) কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট দামে একজন ক্রেতা কোন পণ্যের যে পরিমাণ ক্রয় করে বা ক্রয় করার ইচ্ছা পোষণ করে তাকে চাহিদা বলে।

বিনিয়োগ

বিনিয়োগ বলতে সাধারণত মুনাফার উদ্দেশ্যে ব্যবসা বাণিজ্যে অর্থ খাটানোকে বুঝানো হয়। কিন্তু অর্থনীতিতে বিনিয়োগ বলতে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে নতুন মূলধন সামগ্রীর মজুদ বৃদ্ধি করাকে বুঝায় যার ফলে কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। সুতরাং বিনিয়োগের মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন হলেও তার সাথে জড়িত রয়েছে– ক) নতুন মূলধন সামগ্রীর মজুদ বৃদ্ধি, খ) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং গ) উৎপাদন বৃদ্ধি।
এজন্যই সাধারণত বলা হয়ে থাকে- বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। যেমন-

উপযোগ

কোন পণ্যের অভাব পূরণের ক্ষমতাকে উপযোগ বলা হয়। মূলতঃ একজন ভোক্তা কোন পণ্য ভোগ করে অভাব পূরণ করতে চায়। পণ্যের মধ্যে অভাব পূরণ করার যে ক্ষমতা অন্তর্নিহিত থাকে, তাকেই উপযোগ বলে। উদাহরণ স্বরূপ ঃ একজন ছাত্রের লিখার প্রয়োজন দেখা দিলে তাকে কলম ক্রয় করতে হয়। কারণ কলমের মধ্যে লিখার অভাব পূরণের ক্ষমতা রয়েছে। কলমের এ ক্ষমতাকে উপযোগ বলে।

জাতীয় আয়

সরল অর্থে কোন জাতির আয়কে জাতীয় আয় বলে। জাতি বলতে সাধারণত ঃ সরকার কর্তৃক পরিচালিত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী একটি ভৌগলিক সীমারেখায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে বুঝায়। কাজেই জাতীয় আয় বলতে, কোন নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমারেখায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর আয়কে বুঝায়। তবে অর্থনীতিতে জাতীয় আয়ের সংজ্ঞা দেবার সময় কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়। যেমন-

ক) জাতীয় আয় একটি নির্দিষ্ট সময়ে গণনা করতে হয়;
খ) উৎপাদিত পণ্য ও সেবা অর্থনীতিক কর্মের ফল হতে হবে; এবং
গ) পণ্য ও সেবার আর্থিক মূল্য/ বাজার দাম থাকতে হবে।

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের আলোকে জাতীয় আয়কে নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত করা যায়। যেমন-

কোন নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত ১ বৎসরে) একটি দেশের সকল নাগরিক (উপকরণের মালিক) তথা সকল উপকরণ (ভূমি, শ্রম, মূলধন, সংগঠন) অর্থনৈতিক কর্মে নিয়োজিত থেকে যে পরিমাণ পণ্য ও সেবা উৎপাদন করে তার আর্থিক মূল্যকে জাতীয় আয় বলে।

বিনিয়োগ

বিনিয়োগ বলতে সাধারণ মুনাফার উদ্দেশ্যে ব্যবসা বাণিজ্যে অর্থ খাটানোকে বুঝানো হয়। কিন্তু অর্থনীতিতে নিছক অর্থ খাটিয়ে মুনাফা অর্জন করাকে বিনিয়োগ বলা হয় না। বরং বিনিয়োগ ধারণাটি আরও ব্যাপক এবং বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

অর্থনীতিতে বিনিয়োগ বলতে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে নতুন মূলধন সামগ্রীর মজুদ বৃদ্ধি করাকে বুঝায় যার ফলে কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। সুতরাং বিনিয়োগের মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন হলেও তার সাথে জড়িত রয়েছে-

ক) নতুন মূলধন সামগ্রীর মজুদ বৃদ্ধি;
খ) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; এবং
গ) উৎপাদন বৃদ্ধি।

এজন্যই সাধারণত বলা হয়ে থাকে- বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

একজন গার্মেন্টস ব্যবসায়ীর ৪টি কারখানা রয়েছে। কারখানার ঘরসহ সকল প্রকার যন্ত্রপাতিকে মূলধন বলে। যদি ব্যবসায়ী আরও একটি কারখানা স্থাপন ও চালু করে তাহলে নতুন করে মূলধনের মওজুদ বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বাড়বে। এরূপ মূলধন মজুদ বৃদ্ধিকেই বিনিয়োগ বলা হয়। এককথায়, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মূলধন সামগ্রী উৎপাদন ক্ষেত্রে নিয়োজিত হয়ে কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে তাকে বিনিয়োগ বলে।

অর্থের চাহিদা

সাধারণত ঃ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে সরকার স্বীকৃত সকল প্রকার ধাতব ও কাগজী মুদ্রাকে অর্থ বলা হয়। তবে বিনিময়ের মাধ্যম ছাড়াও অর্থ সঞ্চয়ের বাহন, ঋণ পরিশোধ, দ্রব্য ও সেবার দাম নির্ধারণ-প্রভৃতি প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। আধুনিক বাজার অর্থনীতিতে অর্থ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক ভূমিকা পালন করে থাকে। মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনে নগদ অর্থ হাতে ধরে রাখতে চায় আবার সঞ্চয় আকারেও অর্থ জমা রাখতে পারে। তবে নগদ অর্থ হাতে ধরে রাখার প্রবণতাকেই অর্থের চাহিদা বলা হয়। এক কথায়, কোন নির্দিষ্ট সময়ে সমাজের জনগণ বিভিন্ন প্রয়োজনে যে পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে ধরে রাখতে চায় তাকে অর্থের চাহিদা বলে।

অর্থের ফটকা চাহিদা

দৈনন্দিন লেনদেন ও ভবিষ্যতের সংকট মোকাবিলা ছাড়াও মানুষ ঠকা কারবারের উদ্দেশ্যে নগদ অর্থ হাতে ধরে রাখতে চায়। **ফঠকা কারবারের উদ্দেশ্যে যে পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে ধরে রাখতে চায় তাকে অর্থের ফটকা কারবার জনিত চাহিদা বলে।** যেমন- মানুষ ঋণপত্রে টাকা খাটিয়ে কিছু বাড়তি অর্থ উপার্জন করতে চায়। ঋণপত্রের দান (সুদের হার) বেশি হলে মানুষ ঋণপত্র বেশি ক্রয় করে। সেক্ষেত্রে নগর অর্থের পরিবর্তে মানুষ ঋণপত্র হাতে রাখে তথা নগদ অর্থের চাহিদা কমে। আবার বিপরীত অবস্থায় নগদ অর্থের চাহিদা বাড়ে। অর্থের এরূপ চাহিদাকে ফটকা চাহিদা বলে। অর্থের ফটকা চাহিদা সুদের হারের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ- সুদের হারের সাথে অর্থের ফটকা চাহিদার সম্পর্ক বিপরীত। সুদের হার বাড়লে অর্থের ফঠকা চাহিদা কমে। আবার সুদের হার কমলে অর্থের ফটকা চাহিদা বাড়ে।

মুদ্রাস্ফীতি

অর্থনীতিতে পণ্য সামগ্রী ও সেবার দামস্তর উত্তোরোত্তর/ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবার প্রবণতাকে মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, মুদ্রাস্ফীতি একটি পরিস্থিতি যখন পণ্য সামগ্রী ও সেবার দামস্তর ক্রমাগত বাড়তে থাকে। তবে একটি বা কয়েকটি পণ্যের দাম হঠাৎ কোন কারণে বাড়লেই তাকে মুদ্রাস্ফীতি বলা যাবে না-বরং সার্বিকভাবে পণ্য সামগ্রী ও সেবার গড় দাম বাড়লেই তাকে মুদ্রাস্ফীতি বলা যাবে। মুদ্রাস্ফীতি বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-

১। দামস্তর ক্রমাগত বাড়তে থাকে;

২। অর্থের ক্রয়ক্ষমতা তথা অর্থের মূল্য কমতে থাকে;

৩। অধিক অর্থ দিয়ে অল্প পরিমাণে দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করতে হয়।

৪। সামগ্রীক যোগানোর চেয়ে সামগ্রীক চাহিদা বেশি হয়। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতির ভারসাম্যহীনতা নির্দেশ করে। উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের উপস্থিতিতে একটি দেশে মুদ্রাস্ফীতির পরিবেশ বিরাজ করে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইংরেজী Inflation শব্দের বাংলা করতে গিয়ে কোন কোন লেখক দামস্ফীতি বা মূল্যস্ফীতি ধারণা ব্যবহার করেন।

মুদ্রাসংকোচন

অর্থনীতিতে ক্রমাগত দামস্তর হ্রাস পাবার প্রবণতাকে মুদ্রসংকোচন বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, মুদ্রাসংকোচন একটি পরিস্থিতি যখন দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার দামস্তর কমতে থাকে। মূলত সামগ্রীক তুলনায় যোগানের সামগ্রীক চাহিদা কম হলে দামস্তর কমে এবং মুদ্রাসংকোচন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।
সার্বিক বিচারে মুদ্রসংকোচনের ফলে অর্থনীতিতে মন্দাবস্থা দেখা দেয়।

মুদ্রাসংকোচন/মন্দাবস্থা মোকাবেলায় আর্থিক নীতি

অর্থনীতিতে প্রচলিত অর্থের যোগান বাড়ানো কিংবা কমানোর নীতিকে আর্থিক নীতি বলা হয়। মুদ্রাসংকোচন পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকার আর্থিক নীতি প্রয়োগ করতে পারে। এক্ষেত্রে আর্থিক নীতির লক্ষ্য হবে অর্থের যোগান বাড়ানো। সরকার এক্ষেত্রে-

১। নতুন মুদ্রা চালু করতে পারে;

২। নোটের প্রচলন বাড়াতে পারে;

তাছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহের সম্প্রসারণমূলক ঋণনীতি (expansionary credit Policy) গ্রহণ করতে পারে। যেমন-

১। খোলাবাজারে সঞ্চয়পত্র, ঋণপত্র, ক্রয় করা।

২। ব্যাংক হার কমানো;

৩। সংরক্ষণের হার কমানো এবং

৪। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঋণদানের বাধা তুলে দেয়া।

আর্থিক নীতি

সরল অর্থে, অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার ও আর্থিক কতৃপক্ষ (কেন্দ্রীয় ব্যাংক) যে সব নীতিমালা গ্রহণ করে তাকে আর্থিক নীতি বলা হয়। অর্থাৎ অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ (কমানো বা বাড়ানো) এবং ঋণের ব্যবস্থাপনা নীতিকে আর্থিক নীতি বলে।

আমরা জানি অর্থ সমাজের বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে, ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের উপায় হিসেবে, মূল্যের পরিমাপক হিসেবে, সঞ্চয়ের বাহক হিসেবে এবং আরও অন্যান্য বিষয়ে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে। অর্থ কোন নিরপেক্ষ বিষয় নয়-বা শুধুই বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে না। বরং অর্থ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে নানা ভাবে প্রভাবিত করে। যেমন অর্থ ও ঋণের যোগান বাড়লে অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে আবার অর্থ ও ঋণের পরিমাণ কমলে অর্থনীতিতে মন্দাবস্থা বা বেকারত্ব দেখা দিতে পারে। তাই অর্থ ও ঋণের যোগানকে একটি কাংখিত পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকার ও আর্থিক কর্তৃপক্ষ যেসব নীতিমালা গ্রহণ করে তার সমষ্টিকে নীতি বলা হয়।

আর্থিক নীতিকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১। সম্প্রসারণমূলক আর্থিক নীতি;

২। সংকোচনমূলক আর্থিক নীতি এবং

৩। নিরপেক্ষ আর্থিক নীতি।

রাজস্ব নীতি

সরকারের আয়, ব্যয় এবং ঋণ সংক্রান্ত নীতিমালাকে রাজস্ব বলা হয়। অনেক সময় বাজেটে গৃহীত সরকারের আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত নীতিমালাকেও রাজস্ব নীতি বলা হয়। রাজস্ব নীতিকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১। সম্প্রসারণমূলক রাজস্বনীতি;

২। সংকোচনমূলক রাজস্বনীতি;

৩। নিরপেক্ষ রাজস্ব নীতি।

১। অর্থনীতিতে বেকারত্ব তথা মন্দাবস্থা দেখা দিলে সরকার আয়, উৎপাদন, বিনিয়োগ ও নিয়োগ বাড়ানোর জন্য যে রাজস্ব নীতি গ্রহণ করে তাকে সম্প্রসারণমূলক রাজস্ব নীতি (expansionary Fiscal Policy) বলা হয়।

২। আবার অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে সরকার আয়, সামগ্রীক চাহিদা ও দামস্তর কমানোর জন্য যে রাজস্ব নীতি গ্রহণ করে তাকে সংকোচনমূলক রাজস্ব নীতি (Contractionary Fiscal Policy) বলা হয়।

৩। সরকার কর্তৃক গৃহীত আয়-ব্যয় নীতি অর্থনীতিতে আয়, উৎপাদন, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান প্রভৃতি প্রকৃত উৎপাদনকে প্রভাবিত না করলে তাকে নিরপক্ষ রাজস্ব নীতি (Neutral Fiscal Policy) বলা হয়। মূলত : পূর্ণ নিয়োগ স্তরে আয়স্তর স্থিতিশীল রাখার জন্য এ ধরনের রাজস্ব নীতি সুপারিশ করা হয়।

ব্যাংক

ব্যাংক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা মানুষের নিকট থেকে আমানত/জমা গ্রহণ করে আবার চাহিবামাত্র আমানতকারীকে অর্থ ফেরত এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন মেয়াদে ঋণ দান করে। অর্থাৎ ব্যাংক মানুষের নিকট থেকে আমানত হিসেবে বিভিন্ন মেয়াদে অর্থ জমা রাখে ও ফেরত দেয় আবার ঋণ হিসেবে অর্থ প্রদান করে।

তাই ব্যাংককে অর্থ ঋণের কারবারী (Dealer of creadit) বলা হয়।

তাই ব্যাংক প্রধানত চার প্রকার ঃ

১। বাণিজ্যিক ব্যাংক;

২। কেন্দ্রীয় ব্যাংক;

৩। বিশেষায়িত ব্যাংক: এবং

৪। সুদ বিহনী ব্যাংক।

বাণিজ্যিক ব্যাংক

মুনাফার উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে যে ব্যাংক গঠিত ও পরিচালিত হয় তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলা হয়। যেমন বাংলাদেশের জনতা ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, সিটি ব্যাংক ইত্যাদি বহু নামে একাধিক বাণিজ্যিক ব্যাংক রয়েছে। কিছু বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকও রয়েছে। যেমন- Standard Charatard Bank, Grindlays Bank, Bank Indo-sweez ইত্যাদি।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী

বাণিজ্যিক ব্যাংক যেসব সাধারণ কর্ম সম্পাদন করে তা নিন্মরূপ ঃ

১। আমানত গ্রহণ করা ঃ

বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কাজই হলো জনসাধারণের নিকট থেকে তাদের সঞ্চিত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করা। আমানত বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। যেমন-১) চলতি আমনত ২) সঞ্চয়ী আমনত ৩) স্থায়ী আমনত। চলতি আমানত থেকে চাহিবা মাত্র টাকা তুলা যায় তবে এরূপ আমানতের বিপরীতে আমনতকারীকে ব্যাংক সুদ প্রদান করে না। সঞ্চয়ী আমানতের টাকাও আমানতকারী চাইলে তুলতে পারে তবে এক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট অংকের বেশি টাকা তুলতে হলে ব্যাংককে পূর্বেই তা অবহিত করার নিয়ম আছে। এ ধরনের আমানতের বিপরীতে ব্যাংক আমানতকারীকে সুদ প্রদান করে। স্থায়ী আমনতে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অর্থ জমা রাখা হয়। এর বিপরীতেও আমানতকারী নির্দিষ্ট হারে সুদ পায়।

২। ঋণ প্রদান করা ঃ

বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম প্রদান কাজ হলো ঋণ প্রদান করা। মানুষ যে অর্থ জমা রাখে তার একটি অংশ তারল্যতা বজায় রাখার জন্য রেখে দিয়ে বাকিটা ব্যাংক ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, ভোক্তা প্রভৃতি নানা শ্রেণি ও পেশার মানুষকে ঋণ হিসেবে প্রদান করে। ঋণের বিপরীতে ব্যাংক গ্রহীতার নিকট থেকে সুদ গ্রহণ করে।

৩। বিল গ্রহণ ঃ

বাণিজ্যিক ব্যাংক তার গ্রাহকের পক্ষে বিল গ্রহণ করে। যেমন-বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস বিল সহ সরকার নির্ধারিত বিভিন্ন ফি সরকারের পক্ষে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ গ্রহণ করে।

৪। বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করা ঃ

বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন প্রকারের বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে। যেমন চেক, ভ্রমণকারীর চেক, Credit Card Draft ইত্যাদি আজকাল বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

৫। বিবিধ ঃ

বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রথাগত কাজ ছাড়া সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে আরও কিছু কাজ করে। যেমন-

ক) মূল্যবান অলংকার, দলিলপত্র জমা রাখা;

খ) গ্রাহকের পক্ষে শেয়ার, বন্ড, ডিভেঞ্চার প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয় করা;

গ) গ্রাহকের পক্ষে বীমার প্রিমিয়াম জমা দেবার ব্যবস্থা করা;

ঘ) প্রয়োজনে গ্রাহকের পক্ষে তার ট্রাস্টি বা গ্রান্টার হিসেবে কাজ করা।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের নীতিমালা বা তারল্য ও মুনাফার মধ্যে সমন্বয় সাধন ঃ

বাণিজ্যিক ব্যাংক দুটি প্রধান নীতিমালাকে সামনে রেখে এর কার্যক্রম পরিচালনা করে। যথা-

১। বিশ্বস্ততা (Reliability)

২। অস্তিত্ব (Existence)

১। বিশ্বস্ততা ঃ

একটি বাণিজ্যিক ব্যাংককে ব্যবসা করতে হলে প্রথমত ঃ আমানতকারী জনগণের বিশ্বাস অর্জন করতে হয়। সেটি হল এই যে, আমানতকারী যেন চাহিবামাত্র তার অর্থ ফেরৎ পায়। **আমানতকারীকে চাহিবা মাত্র তার অর্থ ব্যাংক কর্তৃক ফেরৎ দেয়ার ক্ষমতাকে তারল্য (Liquidity) বলা হয়।** বাণিজ্যিক ব্যাংককে বিশ্বাস অর্জন করতে হলে তারল্য বজায় রাখতে হয়।

২। অস্তিত্ব ঃ

একটি বাণিজ্যিক ব্যাংককে ব্যবসায়ে টিকে থাকতে হলে শুধু আমানত গ্রহণ এবং তা পুনরায় আমানতকারীকে ফেরৎ দিলেই চলে না। বরং তাকে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য মুনাফা অর্জন করতে হয়। কাজেই মুনাফা অর্জনের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়। ঋণ-প্রদান কার্যক্রমের মধ্যে দিয়েই বাণিজ্যিক ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে এবং ব্যবসা ক্ষেত্রে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান দুটি নীতিমালা হল-একদিকে তারল্যতা বজায় রেখে বিশ্বস্ততা অর্জন করা এবং অপরদিকে মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা।

কিন্তু তারল্যতা বজায় রাখা এবং মুনাফা অর্জন করা এ দুটি বিষয় মূলত ঃ পরস্পর বিরোধী। কারণ অধিক তারল্যতা বজায় রাখতে গেলে ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা কমে তথা মুনাফা কমে। এক্ষেত্রে বিশ্বাস অর্জন করা গেলেও অস্তিত্ব হুমকীর সম্মুখীন হয়ে পড়ে। আবার অধিক হারে মুনাফা অর্জন করতে গেলে তারল্যতা কমে যায়। এক্ষেত্রে অস্তিত্ব মজবুত হলেও বিশ্বাস হারাতে হয়। তাই বাণিজ্যিক ব্যাংককে তারল্যতা এবং মুনাফা এ দুটি পরস্পর বিরোধী বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হয়। অর্থাৎ ব্যাংক তার সম্পদকে এমনভাবে ব্যবহার করবে যেন তারল্যতাও বজায় থাকে আবার মুনাফাও অর্জিত হয়। ব্যাংকের এরূপ কার্যক্রমকে পোর্ট ফোলিও ম্যানেজম্যান্ট বা পত্রকোষ ব্যবস্থাপনা বলা হয়।

Portfolio -এর শাব্দিক অর্থ হল আলাদা কাগজপত্র রাখার জন্য বহনযোগ্য কোন ব্যাগ। বাণিজ্যিক ব্যাংক তার সম্পদকে দু'ভাগে ভাগ করে রাখে। এক অংশের সম্পদ দিয়ে তারল্যতা মিটায় এবং অপর ভাগের সম্পদ দিয়ে ঋণদান করে। এখন ব্যাংককে ঠিক করতে হয় সম্পদের কতটুকু তারল্যতার জন্য রাখবে আবার কতটুকু ঋণ দানের জন্য রাখবে। মোট সম্পদের এ ব্যবস্থাপনাকে তাই Portfolio management বলা হয়।

একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক তার সম্পদকে এমনভাবে সাজিয়ে রাখে যেন নগদ অর্থের প্রয়োজনে কোন বেগ পেতে না হয় আবার মুনাফা লাভে তথা ঋণ প্রদানেও কেন বিঘ্ন না ঘটে। এ বিষয়টি একটি কাল্পনিক দেনা-পাওনার হিসেবের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাল্পনিক উদ্ধৃত্ত পত্রঃ

দায় ও মূলধন	পাওনা/সম্পদ
১। মূলধন	১। নদ তহবিল
২। সংরক্ষিত তহবিলঃ	২। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট জমা
৩। আমনত তহবিলঃ	৩। অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট জমা
ক) চলতি আমানত ও	৪। আদায়যোগ্য স্বল্প মেয়াদী ঋণ
খ) মেয়াদী আমানত।	৫। বাট্টাকৃত বিল
৪। ঋণ	৬। বিনিয়োগ
৫। অন্যান্য দায়।	৭। প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম
	৮। অন্যান্য সম্পত্তি

উপরের দেনা-পাওনার হিসেবে সম্পদের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, উপর থেকে নীচে অগ্রসর হলে তারল্য কমে কিন্তু মুনাফা যোগ্যতা বাড়ে। আবার নীচ থেকে উপরে অগ্রসর হলে তারল্যতা বাড়ে তবে মুনাফা যোগ্যতা হ্রাস পায়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, তারল্যতা এবং মুনাফার মধ্যে এক ধরনের Trade off সম্পর্ক স্থাপিত হয়। একটি বাড়লে অপরটি ত্যাগ করতে হয়। অর্থাৎ তারল্য ও মুনাফার মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক

একটি দেশে মুদ্রার প্রচলণ, মুদ্রার যোগান নিয়ন্ত্রণ ও অপরাপর সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার কর্তৃক গঠিত ও পরিচালিত ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলা হয়। সকল দেশেই একটি দেশেই একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকে, যা সরকারের পক্ষে দেশের অর্থ বাজারকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পরিচালিত করে। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম বাংলাদেশ ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক হিসেবে সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসেব রাখে, সরকারের আর্থিক পরামর্শ দাতা হিসেবে কাজ করে এবং সরকারের পক্ষে অন্যান্য ব্যাংকের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে। এজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অর্থ বাজারের অভিভাবক বলা হয়। ভারতের কেন্দ্রীয়

ব্যাংক- রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া, যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক "ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম", দি ব্যাংক অব ইংল্যান্ড, দি পিপল'স ব্যাংক অব চায়না, সেন্ট্রাল ব্যাংক অব দ্য রাশিয়ান ফেডারেশন, সৌদি আরব মনিটরী এজেন্সি, স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান ইত্যাদি।

বিশেষায়িত ব্যাংক

বিশেষায়িত ব্যাংক বলতে কি বুঝায়? [What is meant by Specialized Bank?]

অর্থনীতির কোন বিশেষ খাতের উন্নয়নের ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংক গড়ে উঠে তাকে বিশেষায়িত ব্যাংক বলা হয়। যেমন শিল্প ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক, শিল্প ঋণ সংস্থা, গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা ইত্যাদি। উন্নয়নশীল দেশ সমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকার ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পরিকল্পনায় কয়েকটি বিশেষ খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। যেমন- কৃষি খাত, শিল্প খাত ইত্যাদি। অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত সমূহের উন্নয়নে সরকার ব্যাপক ব্যয় বরাদ্ধ করে। এরই অংশ হিসেবে কৃষি ব্যাংক, শিল্প ব্যাংক ইত্যাদি খাত ভিত্তিক ব্যাংক গড়ে উঠে। এ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশেরও কয়েকটি বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যেমন-

১। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক;
২। বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক;
৩। বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা;
৪। বাংলাদেশ গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা;
৫। ইত্যাদি.....।

বিশেষায়িত ব্যাংক সমূহকে আবার উন্নয়ন ব্যাংকও বলা হয়। তাছাড়া অর্থনীতিতে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের চাহিদা পূরণ করে বলে এসব ব্যাংককে আবার দীর্ঘ মেয়াদী ঋণদান সংস্থাও বলা হয়।

সুদ বিহীন ব্যাংক

যে ব্যাংক লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে তথা অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় সুদের ভিত্তিতে নয় তাকে সুদ বিহীন ব্যাংক বলা হয়। এ ব্যাংক ব্যবস্থায় আমানতকারীকে সুদ দেয়া হয় না এবং ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে কোন সুদ নেয়া হয় না। তবে আমানতের অর্থ বিনিয়োগ করে যে লাভ হয় তার একটি অংশ নিয়ম অনুসারে আমনতকারীকে দেয়া হয়। আবার ঋণ গ্রহণকারীর নিকট থেকেও ব্যবসা থেকে লাভের একটি অংশ ব্যাংক গ্রহণ করে। অর্থাৎ আমনতকারী, ঋণগ্রহীতা এবং ব্যাংক কর্তৃপক্ষের মধ্যে অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে সুদবিহীন ব্যাংক পরিচালিত হয়। পবিত্র ইসলামে সুদ দেয়া ও নেয়াকে হারাম ঘোষণা করেছে তবে ব্যবসা থেকে মুনাফা অর্জন করাকে হালাল ঘোষণা করেছে। মূলতঃ ইসলামের এ মূলনীতির উপর ভিত্তি করেই লাভ লোকসানের ভিত্তিতে তথা অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে সুদবিহীন ব্যাংক গড়ে উঠে। বাংলাদেশে পরিচালিত ইসলামী ব্যাংক লিঃ এ ধরনের সুদহীন ব্যাংক এর প্রকৃত উদাহরণ। এক কথায়, ইসলামের বিধান অনুসারে সুদের পরিবর্তে লাভ লোকসানের ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যাংক ব্যবস্থাকে সুদহীন ব্যাংক ব্যবস্থা বলা হয়।

মোট ব্যাংক ৬৩ টি, তালিকাভুক্ত ব্যাংক ৫৬ টি, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক- ৬টি (সর্বশেষ- বেসিক ব্যাংক), ইসলামী ব্যাংক- ৮টি, বিশেষায়িত ব্যাংক ৯টি (সর্বশেষ- পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক), বিদেশী ব্যাংক- ৯টি [সূত্র আপডেট- ২৬ অক্টোবর, ২০১৫]

বাজারসাধারণতঃ বাজার বলতে কোন নির্দিষ্ট স্থান বুঝায় যেখানে পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় হয়। কিন্তু অর্থনীতিতে বাজার বলতে কোন বিশেষ স্থান বুঝায় না। বাজার বলতে কোন পণ্যের ক্রেতা ও বিক্রেতা আছে এবং তাদের যৌথ দর কষাকষির মাধ্যমে নির্ধারিত মূল্যে পণ্যটির লেনদেন বুঝায়। লেনদেন কোন স্থানে হতে পারে অথবা কোন যোগাযোগের মাধ্যমে হতে পারে। পণ্যের অস্তিত্ব এবং ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সংযোগ এক্ষেত্রে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বিস্তৃত অর্থে বাজার দুই ধরণের হতে পারে ঃ ১. পূর্ণ প্রতিযোগিতা এবং ২. অপূর্ণ প্রতিযোগিতা। অপূর্ণ প্রতিযোগিতার অধীনে বাজার ব্যবস্থা প্রকৃত পক্ষে তিন ধরনের হতে পারে ঃ ১. একচেটিয়া কারবার ২. একচেটিয়া প্রতিযোগিতা এবং ৩. ডুয়োপলি এবং ওলিগোপলি বাজার। সাধারণত ঃ পূর্ণ প্রতিযোগিতার অধীনে

অসংখ্য ফার্ম, একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় অনেক ফার্ম, ওলিগোপলিতে কতিপয় ফার্ম এবং মনোপলির অধীনে একটিমাত্র ফার্ম বিরাজমান বলা যায়।

বাজেট ধারণা

বাজেট শব্দটি ফরাসী শব্দ " **Bougette** " শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ **Leather Bag** বা ফোল্ডারকে বুঝায়। যার মধ্যে কিছু অফিসিয়াল কাগজপত্র ভরা হয়। ইংল্যান্ডের **Chancellor Of Exchequer** চামড়ার ব্যাগে ভরে কিছু অফিসিয়াল আর্থিক হিসাব নিকাশের কাগজপত্র হাউজ অব কমন্স এর সামনে উপস্থাপন করেন, যা মূলতঃ বাজেট। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই আর্থিক বিলের কাগজপত্র বছরের নির্দিষ্ট দিনে অর্থমন্ত্রী পার্লামেন্টের সামেন উপস্থাপন করেন। যাকে বাজেট বলে। **বাজেট শব্দটি সর্বপ্রথম ১৭৩৩ সালে ইংল্যান্ডের আর্থিক পরিকল্পনা হিসেবে ব্যবহার করা হয় যা Opened The Budget শিরোনামে প্রকাশিত হয়।**

সরকারী আয়ের উৎসসমূহ (Sources Of Public Income) ঃ

সরকারী আয়ঃ

১। কর রাজস্ব আয়ঃ

ক. প্রত্যক্ষ কর-

১। আয় কর
২। মুনাফা কর
৩। কর্পোরেশন কর
৪। ব্যয় কর
৫। মূল ধনী লাভকর
৬। সম্পদ কর
৭। মৃত্য কর
৮। দান কর
৯। ষ্ট্যাম্প ডিউটি
১০। মটর গাড়ী কর
১১। অন্যান্য কর

খ. পরোক্ষ কর

১। শুল্ক
২। আবগারী কর
৩। Vat
৪। Turnover Tax
৫। Supplementary
৬। অন্যান্য কর।

<u>অ-কর রাজস্ব</u>

১. প্রশানিক রাজস্ব

১. জরিমানা ও বাজেয়াপ্ত
২. লাইসেন্স ফি
৩. বিশেষ ধরণের আদায়
৪. সরকারী এখতিয়ার

২. বাণিজ্যিক রাজস্ব

<u>৩. অ-রাজস্ব</u>

১. নতুন মুদ্রা
২. ঋণ
৩. দান-অনুদান।

কর

কর হল জনগণ কর্তৃক সরকারকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রদেয় অর্থ যার বিনিময়ে ব্যক্তি কোন উপকার দাবী করতে পারে না।

E.R.A. Seligaman বলেন "কর হল বিশেষ কোন সুবিধা ব্যতিরেকে জনস্বার্থে সরকারী ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যক্তি কর্তৃক সরকারকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রদেয় অর্থ"।

J. Dalton বলেন "কর হল বাধ্যতামূলকভাবে সরকারী কর্তৃপক্ষকে প্রদেয় অর্থ যা সম্পর্কিত নয় যে পরিমাণ সেবা সরকার তাকে প্রদান করে এবং এটি আইন অমান্য করার শাস্তিও নয়।"

এডাম স্মিথ বলেন "কর হল রাষ্ট্রকে সহায়তা করার জন্য জনগণের অবদান।

শ্রমিক সংঘ

উৎপাদন ক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমিকেরা নিজেদের নানা প্রকার স্বার্থঃ রক্ষার জন্য যে সংঘ গঠন করে, তাকে শ্রমিক সংঘ বলা হয়। শিল্পকারখানার মালিক এবং শ্রমিকের দ্বন্দ্ব চিরদিনের। মালিক চায় যথাসম্ভব কম মজুরীতে শ্রমিক নিয়োগ করতে। আবার শ্রমিক চায় যথাসম্ভব বেশি মজুরী আদায় করতে। মজুরী ছাড়াও শ্রমিক আরও বহুবিধ সুবিধা যেমন- চাকুরীর নিশ্চয়তা, বোনাস, চিকিৎসা সুবিধা ইত্যাদি মালিকের নিকট থেকে আদায় করতে চায়। তবে এককভাবে কোন শ্রমিক তা আদায় করতে পারের না। তাই সকল শ্রমিক কতগুলে সাধারণ লক্ষ্যকে সামনে রেখে মালিকের সংঙ্গে দরকষাকষির জন্য সংগঠিত হয়। এরূপ সংগঠিত সংঘকেই শ্রমিক সংঘ বা শ্রমিক ইউনিয়ন বলা হয়।